ভোরের কাগজ

তারিখ 07 NOV 1997
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় সাফল্য আছে নিরক্ষরতা দূরীকরণে দারিদ্র্যই বাধা

ইব্রাহীম আজাদ : উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার উল্লেখযোগ্য সাফল্য সত্ত্বেও এখনো সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, কুসংস্কার এবং অতি দরিদ্রদের অনাগ্রহ নিরক্ষরতা সম্পূর্ণ দূরীকরণের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিকে জেলা প্রশাসকদের নিয়োগ ও তাদের বার্ষিক মূল্যায়ন রিপোর্টে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকার্যক্রম বাস্তবায়নে তাদের দক্ষতার বিষয়টিও বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের হিসাব মতে, দেশের ১৬ ও তদূর্ধ্ব বয়সী জনসংখ্যার ৫৭ শতাংশ এখনো নিরক্ষর। ১২ কোটি জনসংখ্যার প্রাথমিক মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমন উপযোগী শিশুর সংখ্যা বাদ দিয়ে বিভিন্ন বয়স ভিত্তিক নিরক্ষর লোকের সংখ্যা ৪ কোটি ৭২ লক্ষ। এ বিপুল জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষর রেখে দেশের সার্বিক উন্নয়ন নয়। কারণ এই নিরক্ষর জনগণ ভাগ্য ও কুসংস্কারে অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নকে তারা সহজভাবে মেনে নিতে পারে না। ফলে সীমিত উৎপাদনশীলতা নিয়ে তারা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

সূত্র জানায়, গত ৫০ বছরে সাক্ষরতার নানা উদ্যোগ নেওয়া হলেও রাজনৈতিক অঙ্গীকার না থাকায় তা সফল হয়নি। ১৯৮০ সাল থেকে এ কার্যক্রম ব্যাপকভাবে শুরু করা হয়। কিন্তু ১৯৮২ সালে সরকার পরিবর্তনের পর তা স্থগিত হয়ে যায়। ১৯৮৭ সালে দেশের ২৭টি থানায় পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়। পরে সরকার নিরক্ষরতা দূরীকরণে ও অব্যাহত শিক্ষা নিশ্চিত করণের জন্য উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার ভিত্তিক খাত হিসেবে চিহ্নিত করে। এ জন্য ১৯৯২ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ নামে আলাদা মন্ত্রণালয় এবং উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর নামে আলাদা অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। এর লক্ষ্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মৌলিক শিক্ষার চাহিদা পূরণের পাশাপাশি যারা স্কুলে যায়নি এবং যারা প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই ঝরে পড়ছে তাদেরকে সাক্ষর করা। কারণ 'সবার জন্য শিক্ষাবিষয়ক বিশ্ব সম্মেলনসমূহে অংশগ্রহণকারী ও ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ২ হাজার সাল নাগাদ 'সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ'।

সূত্র জানায়, ১৯৯১ সালে সরকার প্রথমবারের মতো ব্যাপক ভিত্তিক উপ-আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করে। তখন সমন্বিত উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক অবয়ব সৃষ্টি ও প্রাথমিকভাবে ৭ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫০০ নিরক্ষরকে সাক্ষরতা প্রদানের জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এ জন্য ব্যয় ধরা হয় ৪৪৩৮.০০ লক্ষ টাকা। পরবর্তী বিভিন্ন দাতাসংস্থার অর্থায়নে এ ব্যয়বৃদ্ধি পেয়ে ১০৭৫০.৩৯ লাখ টাকায় উন্নীত হয় এবং সাক্ষর করার কর্মসূচি দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি করে ১৬ লাখ ৬৮ হাজার ১৭৫ জন নির্ধারিত হয়। ৬৪টি জেলার ৮৫টি থানায় পরিচালিত এ কর্মসূচি চলতি বছরের জুনে শেষ হয়। কিন্তু লক্ষ্য মাত্রার চেয়েও ৯ লাখ বেশি সর্বমোট ২৫ লাখ নিরক্ষরকে সাক্ষর করা হয়।

সূত্র আরো জানায়, সাক্ষরতা কার্যক্রমের সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্থানীয় প্রশাসন ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ নিরক্ষরতা যেমন জেলা, থানা প্রশাসন, ইউনিয়ন পরিষদ। পৌরসভা এবং জেলা পরিষদ নিজস্ব উদ্যোগে গণশিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেছে। পাশাপাশি বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক সংগঠনও এ ধরনের কর্মসূচি নিয়েছে। উপ-আনুষ্ঠানিক অধিদপ্তর এ ক্ষেত্রে তাদেরকে বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ ও সাক্ষরতা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান করছে। এ ছাড়া স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে সাক্ষরতা কর্মসূচিকে সামাজিক আন্দোলনে পরিচালিত করারও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যা সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন (টিএলএম) নামে পরিচিত। লালমনিরহাট ও চুয়াডাঙ্গায় এ আন্দোলন আশাতীত সাফল্য দেখিয়েছে।

সূত্র জানায়, বর্তমানে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর সরাসরি এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য কোনো বয়স্ক শিক্ষা পরিকল্পনা করছে না, বা মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত নয়। তৃণমূল পর্যায়ে কর্মসূচি পরিচালনার ক্ষেত্রে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা তথা এনজিওদের প্রচুর অভিজ্ঞতা থাকায় তাদের মাধ্যমেই এখন এ কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। অধিদপ্তর এক্ষেত্রে সার্বিক তদারকির দায়িত্ব পালন করছে। বর্তমানে প্রায় ২৩০টি এনজিও সংস্থা অধিদপ্তরের সম্পূর্ণ আর্থিক সহায়তায় উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত আছে।

সূত্র মতে, এ কার্যক্রমের প্রাথমিক সাফল্য সত্ত্বেও কোনো কোনো গ্রামাঞ্চলে এনজিওবিরোধী মনোভাবের ফলে একার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। বিশেষ করে নিরক্ষর মহিলারা লেখাপড়া শিখতে আগ্রহী হলেও তাদেরকে বাধা দেওয়া হচ্ছে। নানা ফতোয়ার মাধ্যমে তাদেরকে অবরুদ্ধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তা ছাড়া যারা খুবই গরিব যেমন দিনমজুর তারা সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর সন্ধ্যায় বা রাতে লেখাপড়া করতে উৎসাহিত হয় না। ফলে অনেক বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষার্থীর সংখ্যা নগণ্য।

এদিকে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা পরিষদের প্রথম সভায় উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে জেলা প্রশাসকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগকে সম্পৃক্ত করা। উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে দক্ষতাও তাদের বার্ষিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা। মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে থানা নির্বাহী অফিসারদের 'চার্টার অফ ডিউটিজ' এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা। উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া। এনজিওদের কর্মকাণ্ডের সমন্বয়সহ এনজিও পরিচালিত সাক্ষরতা কেন্দ্রসমূহে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য কর্ম পদ্ধতি প্রণয়ন করা প্রভৃতি।